

মাঞ্জিপক্স সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

মুশতাক হোসেন

মাঞ্জিপক্স একটি ভাইরাসজনিত প্রাণিজাত (Zoonotic) রোগ। ১৯৫৮ সালে ডেনমার্কে বিজ্ঞানাগারে একটি বানরের দেহে সর্বপ্রথম এ রোগ সনাক্ত হয় বলে একে মাঞ্জিপক্স বলা হয়। এ রোগটির প্রাদুর্ভাব ১৯৭০ সাল থেকে প্রধানত মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার ১১টি দেশে দেখা যায়। ইতিপূর্বে এ ছাড়া ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, সিঙ্গাপুর সহ অন্যান্য দেশেও এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। তবে সেসব ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আফ্রিকার দেশসমূহে ভ্রমণের ইতিহাস অথবা উক্ত দেশসমূহ হতে আমদানিকৃত প্রাণির সংস্পর্শে আসার ইতিহাস আছে। এ বছরের (২০২২) মে মাস থেকে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াতে মাঞ্জিপক্সের রোগী পাওয়া যেতে থাকে, যারা মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার রোগ উপনৃত অঞ্চলে ভ্রমণ কিংবা সে দেশের মাঞ্জিপক্স বাহক কোনো প্রাণির সংস্পর্শেও আসেন নি। এটিই জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলছে। কোনো কোনো জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানী খারণা করছেন, হয়তো আগেই এ সব দেশে (ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা) মাঞ্জিপক্সের উপস্থিতি ছিল। এখন কোনো অজানা কারণে তা হঠাত করে দুট ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাঞ্জিপক্সের প্রাদুর্ভাবকে বিশ্বের জন্য মাঝারি ধরণের ঝুঁকি বলে চিহ্নিত করেছে।

মাঞ্জিপক্স ভাইরাসের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অর্থোপক্স ভাইরাস। এ জাতির ভাইরাসের মধ্যে রয়েছে গুটিবসন্ত ও কাউপক্স। এ জন্য মাঞ্জিপক্সের সাথে গুটিবসন্ত বা স্মলপক্সের মিল দেখা যায়। আবার মাঞ্জিপক্স ভাইরাসের রয়েছে দু'টো ক্লেড বা উপজাতি। একটি হচ্ছে মধ্য আফ্রিকা ক্লেড — এ উপজাতির মাঞ্জিপক্সে মৃত্যুহার ১০% পর্যন্ত হতে পারে। আরেকটি হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকা ক্লেড — এ উপজাতির মাঞ্জিপক্সে মৃত্যু তেমন নেই। মাঞ্জিপক্সের সুষ্ঠিকাল সাধারণত ৬ থেকে ১৩ দিন, তবে তা সর্বনিম্ন ৫ দিন থেকে সর্বোচ্চ ২১ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

মাঞ্জিপক্স রোগের সাধারণ উপসর্গগুলো হলঃ জ্বর (৩৮° সেন্টিগ্রেডের বেশী তাপমাত্রা), প্রচল্ন মাথা ব্যথা, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লসিকাথিস্টি ফুলে ঘাওয়া ও ব্যথা (Lymphadenopathy), মাংসপেশীতে ব্যথা, অবসাদগ্রস্ততা, ফুস্কুলুড়ি — যা মুখ থেকে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে হাতের তালু পায়ের তালু সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে (সাধারণত জ্বরের ৩ দিনের মধ্যে)। উপসর্গগুলো সাধারণত ২ থেকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

উপসর্গ দেখা দিলে করণীয়ঃ (ক) সবার আগে নিজেকে অন্যদের কাছ হতে আলাদা করে রাখতে হবে; (খ) সাথে সাথে চিকিৎসক/ নিকটস্থ স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে; (গ) সাথে সাথে আইইডিসিআর-এর হটলাইনে (১০৬৫৫) যোগাযোগ করতে হবে।

মাঞ্জিপক্স রোগীর দেহে লক্ষণ দেখা না দিলে রোগী থেকে অন্য কারো মধ্যে ভাইরাসটি ছড়ায় না। শরীরে ফুস্কুলুড়ি (vesicle, pustule) দেখা দেয়া থেকে শুরু করে ফুস্কুলুড়ির খোসা (crust) পড়ে ঘাওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তি হতে রোগ ছড়াতে পারে।

তবে কারো কারো ক্ষেত্রে এটা শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে (দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি যেমন-অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, কিডনি রোগী, ক্যান্সারের রোগী, এইডস-এর রোগী, নবজাতক শিশু, গর্ভবতী নারী), এমনকি মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে। শারীরিক জটিলতাগুলো হলোঃ অকে সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, মানসিক বিভ্রান্তি, চোখে প্রদাহ, এমনকি দৃষ্টি শক্তি লোপ পেতে পারে। যাদের মধ্যে এ রোগের ঝুঁকি বেশী হতে পারেঃ নবজাতক শিশু, গর্ভবতী নারী, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি (যেমনঃ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, কিডনি রোগী, ক্যান্সারের রোগী, এইডস-এর রোগী)। এ সমস্ত রোগী মাঞ্জিপক্সে আক্রান্ত হবার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উপসর্গগুলো আপনা আপনি উপশম হয়ে যায়। ফুস্কুলুড়ির খোসা দূর না হওয়া পর্যন্ত রোগীর তক, চোখ ও মুখের যন্ত্র নিতে হবে। অক-চোখ-মুখ পরিষ্কার রাখতে হবে। তবে উপসর্গ খুবই কঠকর হলে তা নিরাময়ে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়। যেমন জ্বর হলে প্যারাসিটামল, ফুস্কুলুড়ি শুকনো রাখা, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, পরিমিত বিশ্রাম, পর্যাপ্ত পানি ও তরল জাতীয় খাবার গ্রহণ, ইত্যাদি।

মাঞ্জিপক্সের চিকিৎসার জন্য টেকোভিরিম্যাট (Tecovirimat) নামে একটি ঔষধ ২০২২ সালের জানুয়ারিতে ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি অনুমোদন দিয়েছে। তবে ঔষধটি বহুলপ্রাপ্য নয়। বাচ্চাদেরকে প্রয়োজন মাফিক ডিটামিন এ দেয়া যেতে পারে।

মাঞ্জিপক্সে আক্রান্ত বানর থেকে; ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, খরগোশ ইত্যাদি পোষক (Reservoir) প্রাণির মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে। এসব প্রাণি ভাইরাস বহন করে, কিন্তু নিজেরা আক্রান্ত হয় না। এ জন্য এদেরকে পোষক প্রাণি বলা হয়। তবে সাধারণত গৃহপালিত প্রাণী (যেমনঃ গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, মহিষ) থেকে এ রোগ ছড়ায় না।

মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণ ঘটে আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি শারীরিক সংস্পর্শ, ফুস্কুলুড়ির রস (vesicle, pustule)-এর সংস্পর্শ, শরীরের নিঃসরণ (body fluid)-এর সংস্পর্শ, হাঁচি, কাশির মাধ্যমে (দীর্ঘ সময় সংস্পর্শে থাকলে), রোগীর ব্যবহার্য সামগ্রীর সংস্পর্শ দ্বারা।

এ রোগ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার উপায়ঃ (ক) আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাকা; (খ) আক্রান্ত ব্যক্তি এবং সেবা প্রদানকারী উভয়ে মাঝ ব্যবহার করা; (গ) সাবান পানি দিয়ে নিয়মিত হাত খোয়া (৩০ সেকেন্ড ধরে); (ঘ) হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা; (ঙ) আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সাবান/ জীবাণুনাশক/ ডিটারজেন্ট দিয়ে

জীবাণুমুক্ত করা; (চ) আক্রান্ত জীবিত /মৃত বন্য প্রাণী অথবা প্রাকৃতিক পোষক (যেমন ইঁদুর কাঠবিড়লি, খরগোশ) থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা। আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে নিবিড় দৈহিক সম্পর্ক/ ঘোন মিলনে এ রোগ ছড়াতে পারে। মাঞ্জিপঙ্গে একের অধিকবার সংক্রমণ সাধারণত হয় না।

বয়স্কদের তুলনায়, বাচ্চাদের সংক্রমিত হবার আশংকা বেশী। বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেহেতু দুর্বল, সেহেতু তাদের সংক্রমিত হবার কুঁকি বেশী। গর্ভধারণকারী মায়ের কাছ থেকে গর্ভস্থ শিশু-ও সংক্রমিত হতে পারে। গুটিবসন্তের টিকা, মাঞ্জিপঙ্গের প্রতিষেধক হিসাবে অনেকাংশেই কার্যকর হবে। তবে, বিশ্বব্যাপী এ টিকা এখন সহজলভ্য নয়। গুটিবসন্ত ও মাঞ্জিপঙ্গ প্রতিরোধে ২০১৯ সালে আরো একটি অধিকতর নিরাপদ টিকা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেছে। তবে দু'ভোজের এ টিকাও বহলপ্রাপ্য নয়। উল্লেখ্য, যারা ইতিপূর্বে গুটিবসন্তের টিকা গ্রহণ করেছেন (১৯৮০ সালে সর্বশেষ গুটিবসন্তের টিকা দেয়া হয়), তারা মাঞ্জিপঙ্গ সংক্রমণ থেকে অনেকাংশে সুরক্ষিত।

এ রোগটি ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এর জনস্বাস্থ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে। যাদের দেহে মাঞ্জিপঙ্গের লক্ষণ দেখা দেবে, সন্দেহ হবার সাথে সাথে তাকে অন্য সুস্থ মানুষ থেকে পৃথক করে রেখে সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত তার শরীরের ফুস্কুলিংগুলো দূর না হয় এবং ফুস্কুলির খোসাগুলো ঝরে না যায়, ততদিন তাকে আলাদা রাখতে হবে। সন্তুষ্টকৃত মাঞ্জিপঙ্গ রোগীর দেহে লক্ষণ দেখা দেয়ার পর যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাদের মধ্যে কারো মাঞ্জিপঙ্গের লক্ষণ আছে কি না তা খুঁজতে হবে। লক্ষণ দেখা না দেয়া পর্যন্ত সংস্পর্শিত ব্যক্তি স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবেন। তবে সংস্পর্শিত ব্যক্তি কাউকে রক্ত, দেহ কোষ (টিসু), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গা, বুকের দুধ, বীর্য দান করতে পারবেন না (সুষ্ঠিকাল পার না হওয়া পর্যন্ত, মাঞ্জিপঙ্গ রোগীর সংস্পর্শে আসার পরে ২১ দিন পর্যন্ত)। যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী অরক্ষিত অবস্থায় (মান্দ না পরে) মাঞ্জিপঙ্গের রোগী বা তার ব্যবহার্য বস্তুর সংস্পর্শে আসবেন, তাদের কাজ থেকে বিরত রাখার প্রয়োজন নেই। তবে তাঁর শরীরে মাঞ্জিপঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পেল কি না তা সক্রিয়ভাবে নজরদারি করতে হবে দিনে অন্তত ২ বার ২১ দিন পর্যন্ত।

সর্বশেষ তথ্যমতে ৪৪টি দেশে এ রোগের নতুন প্রাদুর্ভাবের তথ্য পাওয়া গেছে (০৫-০৬-২০২২ পর্যন্ত)। এ পর্যন্ত নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা ৯২০ জন। প্রায় সকল মহাদেশেই এ রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে মাঞ্জিপঙ্গ রোগের যে কোন তথ্য জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বা সরকারী যে কোনো কর্তৃপক্ষকে এ সংক্রান্ত খবর জানালে তারা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনসিটিউট (আইইডিসিআর) এ রোগের পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। সংক্রামক ব্যধি হাসপাতালে, মেডিক্যাল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতালের সংক্রামক ব্যধি ওয়ার্ডে এ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

#

লেখক- উপদেষ্টা, রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনসিটিউট (আইইডিসিআর)